
বনবীর
PROTUL BANERJI

ছোটদের রাজস্থান গ্রন্থমালা—দশম গ্রন্থ

বনবীর

'হেন্‌রী ফোর্ড', 'কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ', 'শিলাদিত্য', 'মহারাজ গোহ', 'বাপ্পাদিত্য', 'সমর সিংহ', 'লক্ষ্মণ সিংহ', 'হামির', 'চণ্ড', 'রাণা সঙ্গ', 'রাণা কুম্ভ' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এস্‌-সি.

প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাইভেট) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ
১৯৮৫
৩

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১'৫০

বনবীর

এক

"মা! ও মা!"

চিতোরের রাজ-অন্তঃপুরের অন্যতমা পরিচারিকা শীতলসেনী স্বগৃহে কর্মে ব্যস্ত, এমন সময় পুত্রের ব্যাকুল আহ্বানে বাহিরে আসিয়া দেখে, এক জটাজূটধারী গৈরিক-বসন সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া বনবীর মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

বনবীর শীতলসেনীর একমাত্র পুত্র—দুঃখীর ধন, নয়নের মণি!

মাকে দেখিয়াই বনবীর এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল, "জানো মা, সন্ন্যাসীঠাকুর বলেছেন, বড় হয়ে আমি রাজা হব।"

শিশুর কথা শুনিয়া শীতলসেনীর বক্ষ ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। সাষ্টাঙ্গে সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করিয়া বলিল, "অভাগার ভাগ্য নিয়ে এ উপহাস কেন ঠাকুর? দাসীর ছেলে, রাণার সুনজরে থেকে দু'মুঠো খেয়ে বাঁচলেই যথেষ্ট! বামনকে এ চাঁদের আশা দেখানো কেন?"

সন্ন্যাসীর অধরে মৃদু হাস্য-রেখা দেখা দিল। শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "ভগবানের লীলাখেলা বুঝে উঠা ত' তোমার আমার সাধ্য নয়! তিনি তোমার ছেলের কপালে যা লিখেছেন আমি শুধু তা-ই বল্লাম মা!"

"কিন্তু ঠাকুর, এ যে শুধু দুরাশা নয়,—দুঃস্বপ্ন।"

"বিশ্বাস করতে পারছ না, মা?"

শীতলসেনী অধর দংশন করিয়া বলিল, "অবিশ্বাস করিনে ঠাকুর! কিন্তু বিশ্বাস করতেও যে বড় ভয় করে।"

"বিধিলিপি খণ্ডন হয় না, মা! কোন্ সূত্রে কার ভাগ্যে কি ফ'লে যায়, অন্ধ জীব আমরা, কি ক'রে বুঝব ?"

বলিয়া সন্ন্যাসী ধীরমন্থর গতিতে রাজপথে বাহির হইয়া গেলেন।

শিশু বনবীর জননীকে ক্ষুদ্র বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিয়া বলিল, "রাজা হওয়া খুব মজার, নয় মা? মাথায় সোনার মুকুট ঝলমল করবে, সেপাই-শান্ত্রীরা দেখলেই পথ ছেড়ে দেবে!···কবে রাজা হ'ব মা ?"

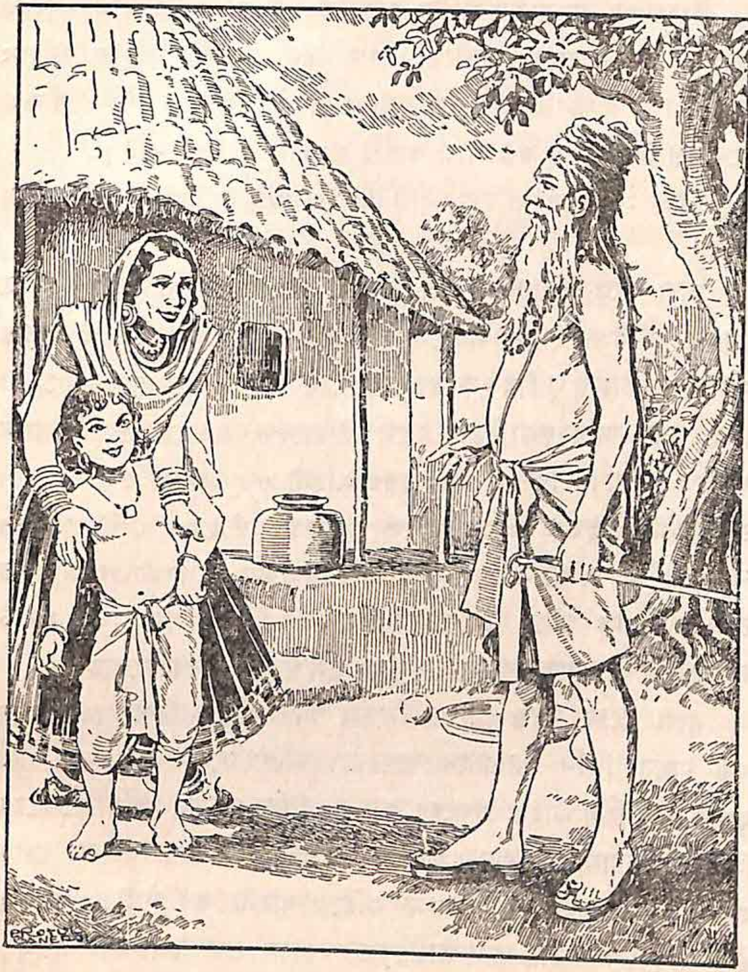
শীতলসেনী সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "বড় হ'লেই হ'বি বাবা!"

"তবে আমি কালই বড় হয়ে যাব!"—বলিয়া অবোধ শিশু তাহার খেলার সাথীদিগকে এই চমৎকার সংবাদটি জানাইবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

শীতলসেনী হাতের কাজ ফেলিয়া সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথাই ভাবিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর বাক্য!—সে ত' মিথ্যা হইবার নয়। অথচ কি করিয়াই যে তাহা সত্যে পরিণত হইবে, তাহাও সে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

চিতোরের রাজ-সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া আছেন মহাবীর সঙ্গ। তাঁহার অভাবে তাঁহার পুত্রগণ সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। ইহার মধ্যে দাসীপুত্র বনবীরের স্থান কোথায়?

শীতলসেনী বসিয়া বসিয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল, কিন্তু সেই ভাবনার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণতম আলোকরশ্মিও তাহার নজরে পড়িল না।



—বিধিলিপি খণ্ডন হয় না, মা! কোন্ সূত্রে কার ভাগ্যে কি ফ'লে যায়,—অন্ধ জীব আমরা, কি ক'রে বুঝব?

দুই

ইহার পর বহু বৎসর অতীত হইয়াছে। শিশু বনবীর আজ পূর্ণবয়স্ক যুবক। কোন্ সুদূর অতীতে কোন্ এক সন্ন্যাসী তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, সে কথা তাহার মনেও পড়ে না। সে কথা মনে করাইয়া দিবার জন্য আজ তাহার জননীও জীবিতা নাই!

কিন্তু সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণী একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই ফলিয়া গেল।

রাণা সঙ্গের সাতজন পুত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রথম দুই পুত্র তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই সঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র রত্ন চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁহাকেও অকালে প্রাণ বিসর্জন করিতে হইল। পিতার মত রত্নও সাহসী ও যুদ্ধকুশলী রাণা ছিলেন। রাজপ্রাসাদের সুখ ও বিলাস অপেক্ষা রণক্ষেত্রই তাঁহাকে বেশী আকর্ষণ করিত। একদা রত্ন সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দিল্লী এবং মালবের রাজধানী মাণ্ডু হইবে চিতোরের তোরণ। দিল্লী তখন মুঘল সম্রাট বাবরের অধিকারগত এবং মালবে তখন সুলতানী শাসন চলিতেছে।

রাণা রত্নের সদম্ভ ঘোষণা নিষ্ফল অতিশয়োক্তি ছিল না। অতি অল্প বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং মাত্র পাঁচ বৎসর কাল ছিল তাঁহার রাজত্বের আয়ু। কিন্তু যতদিন তিনি চিতোরের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন ততদিন পর্যন্ত বহু যুদ্ধের নায়ক মোঘল সম্রাট বাবর মেবারের রাজ্যসীমা আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। তথাপি স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁহাকেও অকালে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়।

রত্ন গোপনে অম্বরের রাজা পৃথ্বীরাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সিংহাসন লাভের বহু পূর্বেই এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কেহই বিবাহের

কথা জানিতেন না। এমন কি, রত্ন নিজেও এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন না। নিজে উপস্থিত না হইয়া তিনি তাঁহার তরবারি অম্বরের রাজকুমারীর নিকট পাঠাইয়া দেন। রত্নের পরিবর্তে রত্নের তরবারির সহিতই অম্বর-রাজ পৃথ্বীরাজের কন্যার বিবাহ হয়।

বিবাহের কথা গোপন রাখিতে রাখিতে এমন অবস্থা হয় যে, অম্বর রাজকন্যা নিজেও হয়ত এই বিবাহের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অন্তত বুঁদীর হারাবংশীয় যুবরাজের সঙ্গে যখন তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব আসে তখন পৃথ্বীরাজের কন্যা কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বুঁদীর যুবরাজকেই বিবাহ করেন। মানে-সম্ভ্রমে বুঁদীর রাজ্যও কিছু কম ছিল না। অতএব এই বিবাহে সকলেই খুশী হইয়াছিল।

রত্ন কিন্তু বিবাহের কথা ভুলেন নাই। চিতোরের রাণা হইবার পর তিনি গোপন বিবাহের কন্যাকে সর্বসমক্ষে আনিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। হয়ত তাঁহার পক্ষে গোপন বিবাহকে প্রকাশ্য বিবাহের মর্যাদা দেওয়াতে বিলম্বও হইয়া গিয়াছিল। তথাপি বিবাহ বিবাহ। তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীকে বুঁদীর যুবরাজ বিবাহ করাতে রত্নের মর্যাদাবোধ আহত হইয়াছিল।

মেবারের পূর্ব সীমান্তে পাহাড়ের মধ্যে বুঁদীরাজ্য অবস্থিত। বুঁদী চিরকালই মেবারের অনুগত। মেবারের প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন স্বরূপ বুঁদী মেবারের রাণাকে কর দেয়। মেবার শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেই বুঁদী মেবারের সাহায্যার্থে সেনা পাঠায়। এতদ্ব্যতীত রাণা রত্ন বুঁদীর রাজকন্যাকেও বিবাহ করিয়াছিলেন।

অতএব মেবার এবং বুঁদীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকা উচিত ছিল। বিশেষত রাণা সঙ্গ পরলোকগত এবং উত্তর ভারতে দুর্দ্ধর্ষ মুঘল

শক্তি উপস্থিত। মেবারের এই দারুণ দুর্দিনে রাজপুত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজন ছিল খুব বেশী। আর অম্বরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া অন্তত বুঁদীর যুবরাজ কোন অন্যায়ই করেন নাই। কারণ তিনি রত্নের সঙ্গে বুঁদীর রাজকুমারীর গোপন বিবাহের কথা কিছুই জানিতেন না!

অথচ এই বিবাহ উপলক্ষ করিয়াই মেবারের সঙ্গে বুঁদীর সম্পর্ক জটিল হইয়া উঠিল। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত রত্ন বুঁদীর যুবরাজ সূর্যমল্লকে হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকিলেন।

আহেরিয়া উৎসব সেই সুযোগ আনিয়া দিল। আহেরিয়া উৎসবে অন্যান্য রাজপুত রাজা ও সর্দারদের সঙ্গে বুঁদীর যুবরাজ সূর্যমল্লও রাণা রত্নের সহিত শিকারে যোগ দিলেন।

শিকারে সবাই যখন মাতিয়া উঠিয়াছে, সবারই লক্ষ্য যখন শিকারের উপর নিবদ্ধ, কেহই কাহারও দিকে তাকাইবার সুযোগ পাইতেছে না, সেই সুযোগে রত্ন তরবারি দ্বারা সূর্যমল্লকে আক্রমণ করিলেন। সূর্যমল্লও রাজপুত বীর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তরবারিও ঝলসাইয়া উঠিল।

আহেরিয়া উৎসবের সেই অপরাহ্নে ঘন অরণ্যের নিবিড় ছায়ায় পরস্পরের নির্দয় আঘাতে দুই রাজপুত যুবকের দেহ বনতলে লুটাইয়া পড়িল।

রত্নের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা বিক্রমজিত চিতোর-সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু যে সমস্ত গুণে রত্ন তাঁহার স্বল্পস্থায়ী রাজত্বে প্রজাপুঞ্জের হৃদয় হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বিক্রমজিতের চরিত্রে তাহার কণামাত্রও ছিল না। তিনি ছিলেন অহঙ্কারী, উদ্ধত প্রকৃতি ও কোপন-স্বভাব। যে সকল সর্দার ও সামন্ত নৃপতিগণ পুরুষানুক্রমে চিতোর-রাণাদের নিকট হইতে সসম্ভ্রম ব্যবহার পাইয়া আসিতেছিলেন,

যাঁহাদের পরামর্শ ব্যতীত রাণারা কোন গুরুতর কার্যেই হস্তক্ষেপ করিতেন না, তিনি তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা দূরে থাকুক্, মানুষ বলিয়াই গণ্য করিতেন না।

রাজপুত বীরদের নিকট পদাতিক সেনা চিরদিনই অবজ্ঞার পাত্র। শুধু শত্রুর দুর্গাদি অবরোধ করিবার জন্যই পদাতিক সৈন্যের প্রয়োজন হইত—এতদ্ব্যতীত সম্মুখ সমরে অশ্বারোহী সৈন্যগণ চিরদিনই তাঁহাদের সমরকৌশল দেখাইয়া আসিয়াছেন। তাই আবহমানকাল হইতে অশ্বারোহী সৈন্য-সামন্তগণই রাণাদের নিকট হইতে নানা সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন।

কিন্তু সিংহাসনে বসিয়াই বিক্রমজিত সে চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিলেন। তিনি মল্লক্রীড়া ও কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় দর্শনে অতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন ; তাই সর্দার ও সামন্ত নৃপতিদের অবহেলা করিয়া মল্লবীর ও পদাতিক সৈন্যগণকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পদাতিক সৈন্যদের প্রতি এতটা অনুগ্রহ প্রদর্শনের কিছুটা কারণও হয়ত ছিল। বাবর সর্বপ্রথম ভারতের মাটিতে যুদ্ধে কামানের ব্যবহার প্রচলন করেন। বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁহার জয়লাভের অন্যতম বড় কারণ এই কামানের ব্যবহার। রাজপুতগণ বন্দুক-কামানের গোলাকে বলিত 'নল-গোলা'। কারণ নলের মধ্য দিয়া গোলাগুলি বাহির হইয়া আসিত। খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের গোলন্দাজ বাহিনীর সম্মুখে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীর ঘোড়সওয়ারগণ তাহাদের শত বীরত্ব সত্বেও অসহায় বোধ করিয়াছিল।

রণক্ষেত্রে কামানগুলিকে সুরক্ষিত করার জন্য পদাতিকদের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। এই কারণে মুঘল সৈন্যদলে পদাতিক সেনাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত।

রাণা বিক্রমজিত মুঘল বাহিনীর অনুকরণে রাজপুত সেনাদলেও পদাতিকদের প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু রাজপুত সৈন্যদলে গোলন্দাজ বাহিনী গঠিত হয় নাই। চিরাচরিত অশ্বারোহী বাহিনীর উপরই রাজপুত রণকৌশল নির্ভর করিত। স্বভাবতই রাজপুত সেনাদলে অশ্বারোহী সৈনিকগণ মর্যাদা ও প্রাধান্য আশা করিতেন। এবং এতদিন তাহারা এই মর্যাদা ও প্রাধান্য পাইয়াও আসিতেছিলেন। পাইক ও পদাতিকদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বিক্রমজিত ঐতিহ্যানুসারী রাজপুত অশ্বারোহী রণকুশলীদের মর্যাদা নষ্ট করিলেন।

ইহার বিষময় ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। সামন্ত নৃপতি ও সর্দার বীরগণ রাণার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন, রাজ্যমধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। প্রাচীনকালে রাজস্থানে সপ্পাবাঈ নামে এক মহিলা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যমধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। তখন হইতে রাজস্থানে অরাজক অবস্থা বুঝাইতে 'সপ্পাবাঈ কা রাজ' প্রবাদের সৃষ্টি হয়। বিক্রমজিতের শাসনকেও লোকে 'সপ্পাবাঈ কা রাজ' বলিতে আরম্ভ করিল। অবসর বুঝিয়া পার্বত্য জাতিগণ চিতোরের নগর-সীমামধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা উপদ্রব আরম্ভ করিল। নিরীহ চিতোরবাসীর প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

বিক্রমজিত দেখিলেন, পার্বত্য ভীলদিগকে দমন না করিলে প্রজাদের সুখশান্তি রক্ষা করা দায়। তাই তিনি সর্দারগণকে ডাকিয়া ভীলদিগকে দমন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

কিন্তু তাঁহারা সে আদেশ উপেক্ষা করিয়া সদম্ভে উত্তর দিলেন, "পদাতিক ও মল্লেরা থাকতে আমাদের আর প্রয়োজন কি? তারাই গিয়ে ভীলদের দমন করুক্।"

এদিকে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। রাণা সঙ্গের ভ্রাতা বীরবর পৃথ্বীরাজ একবার গুর্জর-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া আনেন। রাণা রায়মল্ল অবশ্য পরাজিত শত্রুকে সসম্মানে মুক্তিদান করিয়াছিলেন, কিন্তু গুর্জর-রাজ সে অপমানের গ্লানি গোপনে গোপনে অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন।

এতদিনে সে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তিনি সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করিলেন। মালাবরাজও তাঁহার সৈন্য-সামন্ত লইয়া গুর্জর-রাজ বাহাদুরের সহিত যোগদান করিলেন।

বিক্রমজিত ইহাতে বিন্দুমাত্র ভীত হইলেন না। তিনিও বাহাদুরের এই ধৃষ্টতার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের সংকল্প লইয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

বুঁদী রাজ্যের লৈচা নামক স্থানে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষেই অসংখ্য সৈন্য হতাহত হইতে লাগিল। মুসলমানদের 'আল্লা হো আক্‌বর' এবং রাজপুত সৈন্যদের 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' নিনাদে রণভূমির আকাশ-বাতাস বারংবার বিকম্পিত হইয়া উঠিল। হিন্দু-মুসলমানের রক্তস্রোতে যুদ্ধক্ষেত্র বিশাল রক্ত-সমুদ্রে পরিণত হইল। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সে দিকেই কেবল অগণিত নরমুণ্ড, ছিন্ন-শির দেহ, এবং মৃতপ্রায় বিকলাঙ্গ মূর্তি!

চিতোর সৈন্য ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া আসিতে লাগিল। চিতোরের সামন্তগণ দেখিলেন, জয়ের আর আশা নাই! তাই তাঁহারা রাণা সঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র শিশু উদয়সিংহের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

বিক্রমজিত তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া প্রাণপণে শত্রুসৈন্যের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্যের বিপুল

বিক্রমে বাহাদুরের বিশাল বাহিনী বারংবার পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু তথাপি আর বেশীক্ষণ বাধা দেওয়া চিতোরবীরদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। চিতোরের গৌরব বিধর্মীর কবলে পড়িয়া বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল।

রাজপুত রাজাদের পরস্পরের মধ্যে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে, গৃহ-বৈরিতায় রাজপুত জাতির বহু শক্তি অনর্থক নষ্ট হইয়াছে, আত্মীয়-বিরোধের ফলে বহিঃশত্রুর নিকট রাজস্থানের বহু রাজাকে বারংবার বিপন্ন হইতে হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তবুও তাঁহাদের চৈতন্য-সঞ্চার হয় নাই।

চিতোরের এ সঙ্কট রাজস্থানের সমুদয় রাজপুত রাজা আপনার বিপদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। চিতোরের চিরন্তন সম্মান সমূলে বিনষ্ট হয়, চিতোরের সিংহাসন একজন মুসলমান নরপতির পদানত হয়, ইহা তাঁহাদের প্রাণে সহ্য হইল না। তাই চারিদিক হইতে অসংখ্য রাজপুত রাজা আপন আপন সৈন্য-সামন্তসহ লৈচার যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হইলেন। ঝালোর, আবু, শোণিগুরা, দেবর প্রভৃতি রাজপুত রাজগণের আগমনে বিক্রমজিতের পক্ষ আবার দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মহাসমর উত্তরোত্তর ভীষণ রূপ ধারণ করিল।

তিন

ভট্টগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, মধ্যভারতবাসী মুসলমান যতবার চিতোর আক্রমণ করিয়াছে তন্মধ্যে এই আক্রমণটিই সর্বাপেক্ষা ভীষণ। এই যুদ্ধে বাহাদুরের পক্ষে লাব্রি খাঁ নামে একজন ইউরোপীয়ান গোলন্দাজ ছিল। তাহার পরামর্শানুযায়ী বাহাদুর খাঁ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ করিয়া-

ছিলেন। সেই সকল আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা লাত্রি খাঁ চিতোর-দুর্গের একাংশ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল।

একবার মুসলমান সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই! তাই সত্তু ও দুদু নামে দুই চন্দাবৎ বীর এবং দুর্গারাও নামে এক সামন্ত বীর-বিক্রমে সেই ভগ্ন দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রুসৈন্য যেই রন্ধ্রপথে দুর্গ-প্রবেশের চেষ্টা করে, তৎক্ষণাৎ এই বীরদের তরবারির আঘাতে ছিন্ন-শির হইয়া ভূতলে লুটাইয়া পড়ে। কিন্তু মুসলমান সৈন্যও কম দুর্ধর্ষ নহে। তাহাদের এক দল নিপাত হয়, অবিলম্বে আর এক দল আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে। ক্রমেই উচ্ছ্বসিত সমুদ্র-তরঙ্গের মত মুসলমান সৈন্য চিতোরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবলই মুসলমান সৈন্য।

চিতোর রক্ষার আর কোনই উপায় নাই দেখিয়া রাজমাতা জহরবাঈ স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অসি আস্ফালনে বহু ম্লেচ্ছ সৈন্য ভূমি চুম্বন করিল। বহুক্ষণ অমিত বিক্রমে শত্রুসৈন্য সংহার করিয়া অবশেষে তিনি নিজেই রণক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিতা হইলেন।

যুদ্ধ ক্রমেই অধিকতর ভয়ংকর হইয়া উঠিল। সবার মুখেই এক কথা—চিতোরের শেষ দিন উপস্থিত হইয়াছে।

ইতোমধ্যে বিধ্বস্ত দুর্গ-প্রাকার রক্ষা করিবার জন্য বুঁদীর যোদ্ধাগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস। শত্রু বাহিনীর আক্রমণে বুঁদীর পাঁচশত সৈনিক মৃত্যুবরণ করিল।

এবার প্রাকার রক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন দুর্গা রাও। ছন্দাবৎ সর্দারগণ দুর্গা রাওয়ের সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন।

শত্রুসেনা তখন বিক্রমজিতকে খুঁজিতেছে। তাহারা রক্তিম সূর্য ও সূর্যচ্ছটা মণ্ডিত মেবারের রাজপতাকার সন্ধান করিতেছে। কারণ রাজপুত রণনীতি অনুসারে চিতোরের রাণার নিকটেই পতাকা বাহিত হয়।

শত্রুপক্ষের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া দেওলার যুবরাজ বাঘজী নিজের নিকটেই পতাকা বহন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। চিতোরের রাজপতাকা বাঘজীর মস্তকের উপর উড়িতে লাগিল।

বাহাদুর শাহের সৈন্যদল চিতোরের রাণা মনে করিয়া বাঘজীর প্রতি ধাবিত হইল। বাঘজীও ইহাই চাহিয়াছিলেন।

নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়া বাঘজী বিক্রমজিতের প্রাণরক্ষা করিলেন।

কিন্তু শেষরক্ষা হইল না। চিতোরের সম্মান রক্ষার জন্য একে একে সমস্ত রাজপুত বীরই ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগ্ন দুর্গপ্রাকার রক্ষা করিবার জন্য আর কেহই ছিল না।

মালব ও গুজরাটের সম্মিলিত বাহিনী এই অবকাশে বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত বিপুল বেগে চিতোর দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিল।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বুঁদীর যুবরাজ শূরতান রাণা সঙ্গের নাবালক পুত্র উদয় সিংহকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

এদিকে বন্যার বেগে শত্রুসৈন্য চিতোরে প্রবেশ করিতেছে। রাজপুত রমণীগণ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম বিপন্ন। চিতাশয্যা প্রস্তুত করিবারও সময় নাই।

তখন তাঁহারা এক ভীষণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন—জগতের ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই। একটি বৃহৎ পরিখা ঘিরিয়া বারুদ সাজান হইল। রাণী কর্ণবতী ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুত ললনাসহ সেই পরিখায় প্রবেশ করিলেন।

বারুদে অগ্নিসংযোগ করা হইল। মুহূর্তে সমগ্র পরিখা কম্পিত করিয়া প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ হইল—চারিদিকে আগুন ছড়াইয়া পড়িল। কর্ণবতী ও তের হাজার রাজপুত রমণী সেই আগুনে আত্মাহুতি দিয়া ধর্মরক্ষা করিলেন। চক্ষের নিমেষে ত্রয়োদশ সহস্র চিতোর-কুসুম ভস্মসাৎ হইয়া গেল।

জহর অনুষ্ঠানের পূর্বে শেষ উপায় হিসাবে কর্ণবতী মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে "রাখীভাই" সম্বোধন করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি গুজরাট ও মালবের সম্মিলিত আক্রমণ হইতে চিতোর উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

রাজপুত রমণী সমাজে রাখী একটি পবিত্র অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে রাজপুত রমণীগণ অন্যের সহিত ভ্রাতা-ভগ্নী সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাখীবন্ধ ভাই বিপদে-আপদে ভগ্নীকে রক্ষা করেন। সাধ্য অনুসারে রত্নখচিত স্বর্ণ সূত্র হইতে রেশম, এমন কি সামান্য সূত্র দ্বারাও রাখী প্রস্তুত হয়। অনেক সময় এমনও হয় যে রাখী ভাই নিজ প্রাণ দিয়াও যে বিপন্ন ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করিয়াছে তাহার সহিত কোনদিন চাক্ষুষ পরিচয়ও হয় নাই।

হুমায়ুন রাজপুত রীতির সহিত পরিচিত ছিলেন। তিনি রাণী কর্ণবতীর রাখী গ্রহণ করিলেন।

তবে হুমায়ুন তখন সুদূর বঙ্গদেশ অভিযানে গিয়াছেন। সেখান হইতে কর্ণবতীর আহ্বানে সাড়া দিয়া যখন চিতোরের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কর্ণবতী তের হাজার রাজপুত রমণীর সহিত ভস্মীভূত হইয়াছেন। বাহাদুর শাহ্ চিতোর অধিকার করিয়াছেন।

বাহাদুর শাহের পক্ষে চিতোরে অবস্থান কিন্তু বেশী দিন সম্ভব হয় নাই। মাত্র এক পক্ষকাল তিনি চিতোরে ছিলেন। হুমায়ুনের আগমনের সংবাদ পাইবা মাত্র তিনি চিতোর ত্যাগ করিয়া মালব যাত্রা করেন।

হুমায়ুন চিতোরে প্রবেশ করিয়া দেখেন বাহাদুর শাহ্ নিজ রাজ্য মালবে চলিয়া গিয়াছেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মালবের রাজধানী মাণ্ডুতে পৌছান এবং মাণ্ডু অধিকার করেন। তিনি বিক্রমজিতকে মাণ্ডুতে আনিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। হুমায়ুনের সাহায্যে বিক্রমজিত মেবারের অধিকার ফিরিয়া পান।

রাণী কর্ণবতী দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার রাখীবন্ধ ভাই হুমায়ুন মেবারের শত্রুদের পরাজিত করিয়া রাখীর মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিক্রমজিত আবার বিধ্বস্ত চিতোরের রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এত শিক্ষা পাইয়াও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি আবার অধীন সর্দার-সামন্তদের সহিত পূর্বের মতই দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যে করমচাঁদ দুঃসময়ে রাণা সঙ্গকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, চিতোর-দরবারের সকলেই যাঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিতেন, রাণা বিক্রম একদিন সামান্য কারণে সভামধ্যে তাঁহাকেই নিদারুণ অপমান করিয়া বসিলেন। বৃদ্ধের এই অপমান দর্শনে উপস্থিত সামন্তগণ বিষম ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন এবং বিক্রমজিতকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার হাত হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন।

হতভাগ্য বিক্রম নিজের দোষে পুনরায় সিংহাসনচ্যুত হইয়া রাজ-পরিবারের একাংশেই দীনভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। বিষম অনুশোচনাই তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল।



রাণা বিক্রম একদিন সামান্য কারণে সভামধ্যে তাঁহাকেই
নিদারুণ অপমান করিয়া বসিলেন।

চার

এদিকে অমাত্য ও সামন্তবর্গের মন্ত্রণা-সভা বসিল। চিতোরের সিংহাসন ত' আর শূন্য থাকিতে পারে না। রাজ্য ও রাজ-সিংহাসন থাকিলেই তাহার জন্য একজন রাজা দরকার।

সংগ্রাম সিংহের শিশুপুত্র উদয়সিংহের বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর। বিক্রমজিতের পরিবর্তে এই শিশুই সিংহাসনের ন্যায়-সঙ্গত অধিকারী। কিন্তু রাজ্যে তখন যেরূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে এই শিশুকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে রাজকার্য পরিচালনা করাও নিরাপদ নহে। এখন চাই এমন একজন বীরপুরুষ, যিনি নিজের শৌর্য-বীর্যেই এই বিশৃঙ্খল রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারেন।

অথচ সঙ্গের শিশুপুত্র যে চিরদিনের জন্য তাঁহার পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হন, ইহাও কাহারও ইচ্ছা নহে। তাই মন্ত্রী ও সর্দারগণ মিলিয়া স্থির করিলেন, উদয়সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত চিতোরের কোন বীর যুবককে সাময়িকভাবে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইবে।

তাঁহাদের সকলের দৃষ্টিই তখন বনবীরের উপর পতিত হইল। দাসীপুত্র হইলেও বনবীর যথার্থ ই বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার চেহারাও ছিল রাজপুত্রের মতই। স্বভাবটিও ছিল চমৎকার।

সকলে মিলিয়া তখন তাঁহাকেই রাজপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। বিস্মিত বনবীরের নিকট এ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লোভনীয় হইলেও তিনি প্রথমতঃ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কিন্তু মন্ত্রী যখন বুঝাইলেন, চিতোরবাসী হিসাবে চিতোরের এ বিপদে সহায়তা করা তাঁহার সর্বপ্রধান কর্তব্য, তখন তিনি আর অমত করিলেন না।

দাসীপুত্র বনবীর সত্য সত্যই রাজা হইলেন। সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

রাজা হইয়া বনবীর প্রথম কিছুদিন মন্ত্রী ও সর্দারদের পরামর্শ মতই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় চিতোরের লুপ্ত গৌরব আবার ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হইতে লাগিল।

কিন্তু অল্প-কিছুকাল পরই তাঁহার ঘোর মানসিক পরিবর্তন আরম্ভ হইল। স্বদেশ-হিতৈষণার স্থানে আসিল লোভ; ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তরে রাজত্ব-স্পৃহা বিষম বলবতী হইয়া উঠিল। চিরদিনের জন্য চিতোররাজ্য যাহাতে তাঁহার হস্তগত থাকে, তিনি যাহাতে আজীবন নির্বিঘ্নে নিষ্কণ্টকে চিতোরের সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন, তজ্জন্য গোপনে গোপনে উপায় স্থির করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন, তাঁহার সুখের পথে প্রধান কণ্টক শিশু রাজকুমার উদয়সিংহ ও রাজ্যচ্যুত বিক্রমজিত। রাণার এই দুই বংশধর জীবিত থাকিতে তাঁহার আশা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। উদয়সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই তাঁহাকে এ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আবার পথের ভিখারীই হইতে হইবে। তাই তিনি উদয় ও বিক্রমের প্রাণ সংহারের সঙ্কল্প করিলেন।

সঙ্কল্প স্থির হইতেই তিনি সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তখন হইতেই তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সর্বদাই সন্ত্রস্ত, চমকিত ভাব —সর্বদাই অন্যমনস্ক, সর্বদাই অস্থির-চিত্ত। কেহই তাঁহার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না।

যতই দিন যাইতে লাগিল, বনবীরের মানসিক অস্থিরতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার অন্তরে যে মানসিক দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহার

পীড়নে তিনি দিনরাত অপরিসীম ক্লেশ বোধ করিতে লাগিলেন। একবার রাজ্যলোভই জয়ী হয়, পরমুহূর্তেই বিবেকের দংশনে তিনি জর্জরিত হইয়া পড়েন।

তাঁহার এই মানসিক দ্বন্দ্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে এক অশুভক্ষণে লোভের বেদীমূলেই তিনি আপনাকে নিঃশেষে বিসর্জন দিলেন। রজনীর অন্ধকারের সুযোগ লইয়া দুরাকাঙ্ক্ষী বনবীর বিক্রমজিতের বক্ষদেশে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন। প্রবল রক্তস্রোতের সহিত রাজ্যচ্যুত রাণার হতভাগ্য জীবনের শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটিল।

পাঁচ

এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় রাজ-অন্তঃপুরে ঘোর আর্তনাদ উপস্থিত হইল। সে চীৎকারে কক্ষান্তরে উদয়সিংহের ধাত্রী পান্নার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মাত্র উঠিয়া বসিয়াছেন, নয়নে তখনও নিদ্রার ঘোর লাগিয়া আছে, এমন সময় অন্তঃপুরচারী এক ক্ষৌরকার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল, সর্বনাশ হইয়াছে! বনবীর বিনাদোষে বিক্রমজিতের প্রাণসংহার করিয়াছেন!

এই নিদারুণ সংবাদে পান্নার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, দুরাচার বনবীর শুধু বিক্রমজিতের প্রাণ লইয়াই পরিতৃপ্ত হইবে না, উদয়ের কচি প্রাণটুকুও তাহার হাতে নিস্তার পাইবে না!

কক্ষের স্বল্প আলোকে পান্না শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। একই শয্যায় পাশাপাশি দুইটি শিশু নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রা-

বেশে ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের কচি মুখে দেবদুর্লভ হাসি বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন উদয়সিংহ, অন্যটি তাঁহারই গর্ভের ধন!

পান্না একবার এই নিদ্রিত শিশুযুগলের পানে চাহিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। বিষম ব্যথায় তাঁহার মুখ মলিন হইয়া উঠিল। মুহূর্তের জন্য হয়ত তাঁহার অন্তরে গর্ভধারিণী-জননী ও ধাত্রী-জননীর দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল, মুহূর্তের জন্যই হয়ত তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেম ও সন্তান-বাৎসল্যের সংঘাত উপস্থিত হইল। কিন্তু সে শুধু নিমেষ মাত্র!—পরক্ষণেই তাঁহার আননে ফুটিয়া উঠিল সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, নয়নে ভাসিয়া উঠিল আত্মাহুতির প্রতিচ্ছবি!

ক্ষৌরকার সংবাদ দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। পান্না তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "দাঁড়াও!"

নিকটেই একটি প্রকাণ্ড ফুলের সাজি পড়িয়াছিল। ধাত্রী পান্না অতি সন্তর্পণে নিদ্রিত উদয়সিংহকে তন্মধ্যে শয়ন করাইয়া নির্মাল্য ও বিল্বপত্র দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া দিলেন। তৎপরে সাজিটি সেই ক্ষৌরকারের হস্তে দিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই মুহূর্তে দুর্গ ত্যাগ ক'রে বীরা নদীর তীরে পঞ্চবটীর নিভৃত কোণে অপেক্ষা করো। আমিও কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি!"

বিশ্বাসী ক্ষৌরকার প্রভুপুত্রের বিপদের কথা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই কোন প্রশ্ন না করিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গের বাহিরে প্রস্থান করিল।

ধাত্রী পান্না তখন ধীরে ধীরে আপনার একমাত্র শিশুপুত্রটিকে উদয়সিংহের শয্যায় শোয়াইয়া দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যেই যে-বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

ধাত্রীর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। মুহূর্তকাল পরেই রক্তাক্ত

ছুরিকা হস্তে ভীমমূর্তি বনবীর সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদয়সিংহ কোথায় ?"

বনবীরের সেই হৃদয়হীন প্রশ্ন শুনিয়া মায়ের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য হারাইলেন না। শুধু পাষাণ-প্রতিমার মত নির্বিকার ভাবে শয্যোপরি তাঁহারই পুত্রের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন!

পাষণ্ড বনবীর নিমেষে সেই নিষ্পাপ শিশুর বুকে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিলেন—তন্দ্রাঘোরে অর্ধস্ফুট স্বরে একবার মাত্র 'মা' উচ্চারণ করিয়া শিশুর কোমল-কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইয়া গেল।

বনবীর তাঁহার পাপকার্য সমাধা করিয়াই চলিয়া গেলেন। পান্নার শুষ্ক চক্ষু প্লাবিত করিয়া তখন দরদর ধারা বহিতে লাগিল। কিন্তু তখন মৃত পুত্রের পাশে বসিয়া কাঁদিবার অবসর কোথায়? উদয়সিংহকে নির্বিঘ্নে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাহার কাঁদিবার সময়ও যে নাই! তাই তাঁহার নয়ন-পুত্তলির মুদ্রিত নয়নে জীবনের শেষ স্নেহচুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিয়া, তিনি উদয়সিংহের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বিক্রমজিত ও উদয়সিংহ দুই জনেই হত হইয়াছে মনে করিয়া রাজ-অন্তঃপুরে বিলাপধ্বনি উঠিল। ধাত্রী পান্নার এই গোপন আত্ম-ত্যাগের মর্মান্তিক কাহিনী কেহই জানিতে পারিল না।

ছয়

বীরভূমি চিতোরের পশ্চিম প্রান্ত বিধৌত করিয়া ক্ষুদ্র বীরা নদী কুল্‌কুল্‌ স্বরে বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই তীরে একটি নিভৃত স্থান পঞ্চবটীর ঘন ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। বীর রমনী পান্না সেই অন্ধকার রাত্রিতে

সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহারই নির্দেশমত ক্ষৌরকার চিতোরের ভবিষ্যৎ রাণাকে লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে।

সৌভাগ্য বশতঃ তখনও উদয়সিংহের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। পান্না ধীরে ধীরে সেই নিদ্রিত শিশুকে আপনার বুকে তুলিয়া লইলেন—যে বুকের একদিকে সন্তানহীনা জননীর জ্বালাময় হাহাকার, আর একদিকে আর্ত প্রভুপুত্রের জন্য বিগলিত স্নেহধারা! এক দিকে কঠিন পাষাণ, আর এক দিকে অমৃতের মন্দাকিনী-প্রবাহ! নিদ্রামগ্ন উদয়সিংহ ধাত্রীর বুকে মাথা রাখিয়া অঘোরে ঘুমাইতে লাগিলেন, আর পান্না শঙ্কাব্যাকুল হৃদয়ে সতর্ক পদবিক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রভুপুত্রের জীবন রক্ষা করিবার—চিতোরের রাণা-বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার যে গুরু দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সেদিন শুধু ঐ পার্শ্ববর্তী বিশ্বাসী ক্ষৌরকার ব্যতীত আর কেহই ছিল না।

কিন্তু নিজের নয়ন-পুত্তলিকে চক্ষুর সম্মুখে এমন নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইতে দেখিয়াও যিনি অবিচলিত রহিয়াছেন, সেই বীরহৃদয় এ বিপদে ধৈর্যশূন্য হইবে কেন? যে কোনও উপায়ে হৌক উদয়সিংহকে বাঁচাইতেই হইবে!

প্রথমে তাঁহারা দেবলরাজ সিংহরাওএর নিকট আসিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু বনবীরের ভয়ে তিনি তাঁহাদিগের সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সাহস পাইলেন না। এ ভাবে দ্বারে দ্বারে আশ্রয় লাভে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবশেষে তাঁহারা কমলমীরে কুম্ভমেরু দুর্গে আসিয়া উপনীত হইলেন। আশা শা নামে এক জৈন বীর সে সময় সে দুর্গের অধিপতি ছিলেন। বনবীরের ভয়ে তিনিও উদয়সিংহকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না।

আশা শার জননী তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রের এই কাপুরুষোচিত ব্যবহারে নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "তুমি চিতোর রাণার অধীন সামন্ত নরপতি! অথচ প্রভু-পুত্রের এই দুর্দিনে তোমার বিশাল দুর্গে তাঁর জন্য এতটুকু স্থান হ'ল না! কিন্তু জেনো, এই বৃদ্ধা জননীর স্নেহের দুর্গে তাঁর আশ্রয়ের অভাব হবে না!"

এই বলিয়া তিনি সস্নেহে শিশু উদয়কে তাঁহার কোলে টানিয়া লইলেন। জননীর এই স্নেহের তিরস্কারে আশা শা তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া বিষম লজ্জিত বোধ করিলেন।

তিনি মাতৃ-চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর, মা! এ বাহুতে যতদিন বিন্দুমাত্র শক্তি থাকবে, ততদিন কেহই রাণা সঙ্গের বংশধরের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। তোমার চরণ স্পর্শ ক'রে আজ এই প্রতিজ্ঞা করলাম। আশীর্বাদ কর মা, আমাকে যেন এ প্রতিজ্ঞা থেকে ভ্রষ্ট হ'তে না হয়।"

আশা শার জননী তাঁহার পুত্রের মস্তকে কল্যাণ-হস্ত বুলাইয়া বলিলেন, "আশীর্বাদ করি বৎস! তোমার এ প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকুক্।"

শিশু উদয় কুম্ভমেরু দুর্গে মানুষ হইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল। শিশু উদয় শৈশব হইতে কৈশোর, কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার তেজবীর্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

আশা শা উদয়সিংহকে তাঁহার ভাগিনেয় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি, রাজোচিত আচরণ দেখিয়া অনেকের মনেই নানা সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল।

অবশেষে এক ঘটনাচক্রে তাঁহাদের এই সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল।

আশা শার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহারে বসিয়াছেন, এমন সময় উদয়সিংহের সহিত এক দধি-পরিবেষকের বিষম কলহ উপস্থিত হইল। উদয়সিংহ যেরূপ অবহেলার সহিত তাঁহার প্রতিপক্ষের হস্ত হইতে দধিভাণ্ড কাড়িয়া লইলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন, এবং এই মহা শক্তিধর যুবক যে আশা শার ভাগিনেয় নহেন, পরন্তু ছদ্মবেশী কোন রাজকুমার, সে বিষয়ে তাঁহাদের আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না!

ইহার কিছুদিন পর শোণিগুরু-সর্দার কমলমীরে আশা শার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া উদয়সিংহকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। উদয়ের মুখে রাণা সঙ্গেরই প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

এক মুখ দুই মুখ করিয়া এই কথা ক্রমে ক্রমে চিতোরেও রাষ্ট্র হইয়া গেল। উদয়সিংহ বাঁচিয়া আছেন—এ শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিতোর-বাসীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহারা দলে দলে তাহাদের প্রকৃত রাণাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য কমলমীরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ধাত্রী পান্না ও ক্ষৌরকার তখন সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া দিলেন। ধাত্রীর এই দেবদুর্লভ ত্যাগের পরিচয়ে সকলেই তাঁহার অশেষ সাধুবাদ করিতে লাগিল।

উদয়সিংহ তাঁহার প্রাণদাত্রীর এই অভিনব পরিচয় পাইয়া বলিলেন, "মা, গর্ভে ধারণ না করিয়াও তুমি মায়ের চেয়ে বেশী করিয়াছে। তোমার এই স্নেহের ঋণ এ-জীবনে শোধ করা আমার সাধ্য নয়। তোমাকে কি পুরস্কার দিলে যে তৃপ্তি হয় তা' ভেবেই পাইনে!"

বৃদ্ধা পান্নার দুই চক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। তিনি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "পুরস্কার! আমাকে পুরস্কার—দিবি তুই!



উদয়সিংহ 'মা' 'মা' বলিয়া বৃদ্ধার বাহুবন্ধনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

তবে তা-ই হৌক্—তোর ঐ মধুর কণ্ঠে বার কয়েক 'মা' ব'লে ডাক্। আমার এতদিনের তপ্ত প্রাণ শীতল হোক্!"

উদয়সিংহ তখন 'মা' 'মা' বলিয়া বৃদ্ধার বাহুবন্ধনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া ধারা বহিতে লাগিল—সেই পবিত্র অশ্রুতীর্থে পান্না আবার তাঁহার হারান পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন।

সাত

এদিকে বনবীর দিন দিনই অশান্ত ও দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহার অত্যাচারের মাত্রাও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি যে একজন সাধারণ দাসীপুত্র, কেবল চিতোরের মন্ত্রী ও সর্দারগণের অনুগ্রহেই যে সিংহাসন লাভ করিয়াছেন,, সম্পদের দিনে সে কথা একেবারেই তিনি ভুলিয়া গেলেন।

তাঁহার এ অত্যাচারের প্রধান কারণ—তাঁহার প্রতি চিতোরের সর্দার ও সামন্তগণের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের অভাব। বনবীর সিংহাসনে বসিয়া আশা করিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহাকে রাণার সম্মানই প্রদান করিবেন। কিন্তু তিনি যে রাণার পবিত্র বংশোদ্ভূত নহেন, সামান্য দাসীপুত্র মাত্র—মদগর্বে অন্ধ বনবীর সে কথা বিস্মৃত হইলেও সর্দার ও সামন্তগণ তাহা বিস্মৃত হইবেন কেন?

তাই তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিতেন। তদুপরি বিক্রমজিত ও উদয়সিংহ সম্পর্কে তাঁহার এই পৈশাচিক আচরণের পরিচয় পাইয়া সকলেই তাঁহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সুযোগের আশায় তাঁহারা এতদিন চুপ করিয়াছিলেন, এখন

উদয়সিংহ জীবিত আছেন জানিয়া তাঁহারা তাঁহাকে চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

বনবীর প্রজদের মনোভাব দর্শনে বুঝিলেন, তাঁহার সুখের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাই তাঁহার অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কারণে অকারণে তিনি সামন্তগণকে অপমান করিতে লাগিলেন।

রাজপুত রাজগণের ভুক্তাবশিষ্টকে 'দুনা' বলা হয়। যে সকল সামন্ত বা সর্দার বিশেষ সম্মানীয় বা রাণার অনুগৃহীত, শুধু তাঁহারাই রাণার দুনা ভক্ষণের অধিকারী। রাজানুগৃহীত সামন্তগণ দুনা ভক্ষণ বিশেষ সম্মানের বলিয়া মনে করেন, এবং দুনা খাইতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন।

কিন্তু বনবীর দাসীপুত্র বলিয়া কোন সামন্তবীরই তাঁহার দুনা ভোজনের বিন্দুমাত্র প্রয়াসী ছিলেন না। তথাপি মদগর্বিত বনবীর চন্দাবৎ নামে এক রাজপুত বীরকে একদিন দুনা ভক্ষণ করিতে আদেশ করিলেন।

দাসীপুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হইবে শুনিয়া চন্দাবৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি সরোষে উত্তর দিলেন, "পবিত্র রাণা-বংশের দুনা আমাদের শিরোধার্য। কিন্তু তাই ব'লে কি দাসীপুত্রের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করতে হবে? তৎপূর্বে যেন মৃত্যু হয়!"

চন্দাবতের এই অপমানে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। সমুদয় সর্দার মিলিয়া উদয়সিংহকে চিতোরে আনয়ন করিবার জন্য কমলমীরে যাত্রা করিলেন। সেখানেই তাঁহারা তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং নূতন রাণাকে লইয়া চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

উদয়সিংহের এই অভিযানে বাধা দেওয়া বৃথা বুঝিতে পারিয়া বনবীর চিতোরের দুর্গদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল।

উদয়সিংহের সৈন্যদল কৌশলে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। নাম মাত্র যুদ্ধের পর উদয়সিংহের বিজয়-বৈজয়ন্তী সগৌরবে চিতোর-দুর্গে উড্ডীন হইল। রাণা সঙ্গের চিতোর তাঁহার পুত্রের করতলগত হইল।

বনবীরের প্রাণসংহার কাহারও অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁহার এই কলঙ্কিত মুখ লইয়া আর চিতোরে থাকিতে চাহিলেন না। চিতোরের সিংহাসন হারাইয়া চিতোরের মায়া কাটাইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

সৎভাবে রাজত্ব করিয়া যথাসময়ে উদয়সিংহের করে স্বেচ্ছায় চিতোরের সিংহাসন প্রত্যর্পণ করিয়া দিলে, যিনি রাজ্যহারা হইয়াও চিতোরবাসীর মনে চিরদিন রাজার আসন লাভ করিতে পারিতেন, লোভ ও দুর্বুদ্ধির দোষে তাঁহার জীবনে আর সে সৌভাগ্য লাভ হইল না।

সন্ন্যাসী যথার্থ ভবিষ্যদ্বাণীই করিয়াছিলেন, কিন্তু বনবীর নিজের দোষেই শেষজীবনে সে বাণী বিফল করিয়া দিলেন। তাই বনবীরের নাম উচ্চারণ করিলে আজ চিতোরবাসীর মনের মুকুরে ফুটিয়া উঠে শুধু এক রাজ্যলোভী দস্যুর নিষ্ঠুর ছবি!

উদয়সিংহ কিন্তু প্রজাদের মনের প্রত্যাশা পূরণ করিতে পারেন নাই। স্বভাবে তিনি ছিলেন অতি ভীরু প্রকৃতির মানুষ। বাপ্পাদিত্যের বংশের শৌর্য ও বীর্য তাঁহার কিছুই ছিল না। উদয়সিংহের অকর্মণ্যতা রাজপুত সর্দারদের তাঁহার প্রতি বিমুখ করিয়া তুলিল। রাণা উদয়সিংহের ভীরুতা ও অকর্মণ্যতার তুলনায় তাহাদের নিকট রাণা রত্নের অবিমৃষ্যকারিতা অথবা বিক্রমজিতের হঠকারিতাও যুদ্ধপ্রাণ দুর্ধর্ষ রাজপুত রাজা ও সর্দারদের নিকট অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য ছিল। অবস্থা চরমে উঠিল যখন উদয়সিংহ তাঁহার উপপত্নীর কথা মত রাজ্য চালাইতে আরম্ভ

করিলেন। উদয়সিংহের আচরণে মেবারের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেই প্রমাদ গণিলেন।

উদয়সিংহ যখন মেবারের রাণা, হুমায়ুনের পুত্র আকবর তখন দিল্লীর মুঘল বাদশাহ্। অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলি মুঘল শাসনের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেও এবং মুঘল রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিলেও মেবার কখনও দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করে নাই। মেবারের গর্বোন্নত শির চিরকাল দিল্লীকে অবহেলা করিয়াছে।

মুঘল সম্রাট আকবর মেবারের এই স্বাধীনতা স্পৃহা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ধূলায় লুটাইয়া দিতে চাহিলেন। তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন। আকবর তখন মাত্র পঁচিশ বৎসরের যুবক।

আকবরের প্রথম আক্রমণ চিতোর প্রতিহত করিল। উদয়সিংহের উপপত্নী চিতোর রক্ষার জন্য স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই দুঃসাহসী মহিলা মুঘল শিবিরে হানা দিয়া বাদশাহ্ আকবরের নিজস্ব ঘাঁটি পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। উদয়সিংহ বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহার উপপত্নীর জন্যই চিতোর রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। উদয়সিংহের উক্তি রাজপুত সর্দারদের আত্মাভিমানে আঘাত করিল। চিতোর রক্ষায় উপপত্নীর ভূমিকা স্বীকার করিয়া লইলেও বীর রাজপুত সর্দারদের ভূমিকাও কিছু কম ছিল না। বিক্ষুব্ধ সর্দারগণ সুযোগ বুঝিয়া উদয়সিংহের উপপত্নীকে হত্যা করিল।

রাজপুতদের মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আকবর পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। এবারের মুঘল সৈন্যদল আরও বেশী সুসজ্জিত ও সুগঠিত। সৈন্য সংখ্যাও প্রচুর। রাজপুতগণও বিভেদ ভুলিয়া মুঘলবাহিনীর সম্মুখীন হইল। পাণ্ডৌলি গ্রাম হইতে বুসি পর্যন্ত—

দীর্ঘ দশ মাইল জুড়িয়া মুঘল শিবির স্থাপিত হইল। আকবরের নিজ শিবিরে একটি সুউচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ নির্মিত হইল। স্তম্ভশীর্ষে একটি কলস রক্ষিত ছিল। কলসটি ছিল তৈলাধার। রাত্রিবেলা কলসটিকে প্রদীপ রূপে ব্যবহার করা হইত। স্থানটিকে রাজোয়ারার লোক এখনও বলে—আকবর কী দেওয়া—আকবরের প্রদীপ।

চিতোর রক্ষার যুদ্ধে হাজার হাজার রাজপুত প্রাণ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বীরত্বের তুলনা নাই। তথাপি এই বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যেও জয়মল ও পুত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চিতোর দুর্গের উত্তর ভাগ রক্ষার দায়িত্ব জয়মলের উপর অর্পিত ছিল। জয়মল মুঘল শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন। আকবর সগর্বে বলিতেন যে, তিনি স্বহস্তে জয়মলকে হত্যা করিয়াছিলেন। পুত্ত ছিলেন মাত্র ষোল বৎসরের বালক। পুত্তের পিতা আকবরের প্রথম মেবার আক্রমণের সময় যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার মেবার আক্রমণের সময় পুত্তের মাতা নিজ হাতে সন্তানকে গৈরিক সাজে সজ্জিত করিয়া দেন। রাজপুত সৈনিকগণ যুদ্ধের সময় গৈরিক বসন পরিধান করিতেন। শুধু তাহাই নয়। এই বীরমাতা স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধে পুত্তের স্ত্রী বালিকা বধূটিকেও রণসজ্জায় সজ্জিত করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া নিজেও রণক্ষেত্রে অগ্রসর হন। প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টার নারীদের বীরত্বের বহু আখ্যান শোনা যায়। কিন্তু মেবারের স্বাধীনতা যুদ্ধে পুত্তের মাতার ভূমিকা তাহাদের বীরত্বের সব গৌরবই ম্লান করিয়া দেয়। যুদ্ধে পুত্ত, পুত্তের বালিকা বধূ এবং পুত্তের মাতা সকলেই প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন।

ক্রমশই সাগরের মত বিশাল মুঘল বাহিনী স্বল্প সংখ্যক রাজপুত্র সেনাদের গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। চিতোর দুর্গের অবশিষ্ট আট হাজার

রাজপুত সেনা তখন কঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। আট হাজার রাজপুত সেনা একত্রে 'বীরা' বা পান খাইলেন। রাজপুত প্রথা অনুসারে একত্রে পান গ্রহণ সমমর্মিতা প্রকাশের লক্ষণ। তারপর তাঁহারা জীবন পণ করিয়া যুদ্ধ শুরু করিলেন। যুদ্ধে তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আত্মসমর্পণ করেন নাই।

যুদ্ধের পর রণক্ষেত্রে নিহত রাজপুত সৈনিকদের উপবীত সংগ্রহ করিয়া আকবর ওজন করিয়াছিলেন। ওজনের মোট পরিমাণ ছিল ৭৪½ মান (মণ নয়)। চার সেরে (প্রায় চার কে. জি.) এক মান হয়। তখন হইতে চিতোর ধ্বংসের স্মৃতি চিরকাল জাগ্রত রাখিবার জন্য রাজপুতদের মধ্যে ৭৪½ সংখ্যাটি অভিশপ্ত সংখ্যারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। চিঠিপত্রের উপরে ৭৪½ লিখিত থাকিলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ সেই চিঠি খুলিবে না। খুলিলে চিতোর ধ্বংসের অভিশাপ তাহাকে স্পর্শ করিবে।

আকবর চিতোর অধিকার করিলেন।

নিস্তব্ধ রক্তপিচ্ছল পথ বাহিয়া মুঘল বাহিনী সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় চিতোর দুর্গে প্রবেশ করিল।

সেদিন আদিত্যবার। সূর্যের দিন। সেই দিনান্তের ভয়াল সন্ধ্যায় চিতোরের সূর্য সূর্যসন্তান শিলাদিত্যের বংশধরদের উপর শেষ রশ্মিপাত করিয়া দিয়া গেল।

—ঃ রাজস্থান গ্রন্থমালা ঃ—

একাদশ গ্রন্থ

রাণা প্রতাপ